বেলা অবেলার কথা

কৃষক সংগঠক আয়ুব হোসেন : এখন অবেলায়

ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস

আয়ুব হোসেন। পিতা মরহুম আবু বকর। সাকিন কুটুরাকান্দি, উপজেলা বাঘারপাড়া, জেলা যশোর। একজন কৃষক সংগঠক। তিনি কেউকেটা কেউ নন। রাজনীতিবিদও নন। দেশের খুব বেশি মানুষ তাকে চেনে না বা জানে না। তাই তাকে নিয়ে লেখাজোখা করার কী আছে? ... তবুও তাকে নিয়ে একবার লিখেছিলাম, এই কলামে প্রায় সাত বছর আগে। আজ আবার লিখছি। তিনি মাঝে মাঝে খবরে আসেন। টিভিতেও কদাচিৎ দেখা যায় তাকে। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপিন্স তাদের 'রাইস টু ডে' মাসিক জর্নালে তাকে নিয়ে একটি ছোটখাটো প্রবন্ধ ছাপিয়েছিল।

তিনি একেবারেই সাদামাটা মানুষ। লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি আবৃত শরীর। পায়ে চপ্পল। শরীরে ডায়েবেটিস। আর হৃদরোগ। অথচ নিয়ম- নিষ্ঠার বালাই নেই। এভাবেই দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিখ্যাত অধ্যাপকের বাসা থেকে আমাদের মতো সাধারণ গবেষকদের কক্ষ পর্যন্ত দিব্যি ঘুরে বেড়ান। মাসে একবার অন্তত গাজীপুর আসেন। ঢাকায় আসেন। ঢাকায় আসার রুটও দিব্যি অদ্ভুত। কুটুরাকন্দি থেকে সাধারণ ভ্যানে সদর রাস্তা; তারপর ২৫ কিলো দূরে যশোর রেল স্টেশন। সেখান থেকে ঢাকাগামী ট্রেনে। এরপর জয়দেবপুরে অবতরণ। এর আগে যশোর থেকে কারও মোবাইল ধার করে আমাকে উদ্দেশ্য করে একটি টেলিফোন, 'স্যার, শরীরটা ভালো না। সকালে দেখা হবেনে'। দেখা যাবে দশটা নাগাদ আমার অফিসে হাজির। আমাদের ডরমেটরিতে বলে দেয়া আছে। তার থাকা- খাওয়ার সাধারণ ব্যবস্থা আমার অফিস থেকে করা হয়। তিনি আমার সঙ্গে যে আলাপ করেন, তা হলো এলাকার উন্নয়ন। তার বণিক কৃষি ক্লাব কীভাবে এগুবে। লেবুতলার চাষিদের পরবর্তী গন্তব্য কোথায়। নাটোরের মা- ায় কৃষি লাইব্রেরির খবর কী? নওগাঁর আদিবাসীদের ওখানে যেতে হবে। গাজীপুরের কোচদের নিয়ে একটা কর্মসূচি নিলে কেমন হয়। আমার এক সময় মনে হয়েছিল তিনি শুধু আমার কাছেই আসেন। পরে জেনেছি আমি তার অনেক পরের একজন কাছের ব্যক্তি। তিনি আন্তরিকভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছেন অ্যামিরেটাস সায়েন্টিস্ট ড. বদরুদ্দোজার সঙ্গে, বার্কের সদস্য পরিচালক ড. গুল হোসেনের সঙ্গে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুগোল বা দর্শন বিভাগের অনেক অধ্যাপকদের সঙ্গে। হয়তো আরও অনেকের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল বা আছে, আমি সব জানি না। তিনি গাজীপুরে শুধু মাসে একবারই আসেন না। আমাদের কৃষি গবেষণা- ধান গবেষণা এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কর্মশালা থাকলে তিনি যোগদান করেন। তিনি নেমন্তন্ন পেলেও আসেন, না পেলেও আসেন বা শুধু খবর পেলেও আসেন। উদ্দেশ্য আধুনিক কৃষির খবরাখবর নেয়া। অর্থাৎ তিনি আধুনিক কৃষির ফেরিওয়ালা। এমন অনেক ফেরিওয়ালার কথা আমরা শুনেছি। যেমন পলান সরকার। যিনি ফেরি করে করে বই পড়ানোর অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করেন, কার্তিক পরামাণিক যিনি গাছ লাগানোর ফেরিওয়ালি করেন। আর নওগাঁর সেই লাইব্রেরিওয়ালা যিনি তার নিজের বাড়িতে বিরাট একটি কৃষি লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন।

কোন প্রযুক্তির খবরই তার নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। আমি সংবাদে প্রধানত ধান নিয়ে লিখি। সংবাদ মফস্বলে তেমন যায় না। তিনি তার গ্রাম থেকেই মাঝে মধ্যে খবর নেন, কবে কী লিখছি। কোনো দিন পছন্দের কিছু থাকলে তার এলাকায় একবারে যতগুলো সংবাদ পাওয়া যায় সব তিনি কিনে নিয়ে যান। একবার ঢাকায় এসে আমার একটি লেখার জন্য সংবাদের ২৫০ কপি কিনেছিলেন তার নিজের এলাকার মানুষের জন্য। সংবাদ কর্তৃপক্ষ এটা জানে কি না আমি জানি না। প্রায় বছর খানিক ডেইলি সান পত্রিকায় লিখেছিলাম। বিষয় ঐ ধান। এক দিন শুনি আড়াই শ' কপি ডেলি সান কিনে নিজের এলাকায় স্কুল এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। আমি তাকে পরে বলেছি, 'কী পাগলামি করেছেন, এটা তো ইংরেজিতে লেখা'। তিনি নির্বিকার হেসে বলেছেন, বিষয়টি যেখানে ধান, সেখানে ভাষা কোন বিষয় নয়। এমনও হয়েছে, আমার অফিসের পেপার ক্লিপিং থেকে আমার লেখা নিয়ে গেছেন। গ্রামে গিয়ে শত শত কপি করে চাষিদের মাঝে বিলি করেছেন। তাকে জিগ্যেস করেছি কেন করলেন। তার সাফ জবাব, আমি কাগজ নয় প্রযুক্তি বিলি করেছি। সেখানে ধানের কথা এবং জ্ঞানের কথা ছিল। আমি জানি শুধু আমার বিষয় নয় অন্যের বিষয়ও যদি ভালো লাগে, তিনি একইভাবে তার এলাকার মানুষের জন্য এভাবেই বিতরণ করতে ভালো বাসেন। কিছু দিন আগে দৈনিক বণিক বার্তার পক্ষ থেকে দেশের নদী- সম্পদের ওপর একটি বিশেষ সংখ্যা করা হয়েছিল। তিনি একই কারবার করেছিলেন। ক'দিন আগেই এই বণিক বার্তায় খবর হয়েছিল্ত- দেশে আরও পাঁচটি ধানের জাত উদ্ভাবন করা হলো। তিনি আমাকে জানালেন যে প্রায় ২০০ কপি বণিকবার্তা কিনে তিনি চাষিদের মাঝে বিলি- বণ্টন করেছেন। এ মানুষটির চাহিদা তেমন কিছু আছে বলে মনে হয় না। আমার অফিসে

যখন আসেন তখন তার শ্রমক্লান্ত চেহারা দেখে মায়া হয়। হয়তো অফিসে একরাত থাকেন। সকালে আমার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে আবার ঢাকায় ডায়বেটিক হাসপাতালে চলে যান। ফেরার সময় আবার দেখা করে সটান যশোর। অবশ্যই ট্রেনে করে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি তার অন্যতম লক্ষ্য। বা তিনি মনে করেন আমি তাকে সময় দেই বা অন্য কিছু। ধানে চাকরি করি, ধান অন্যতম ফসল সেজন্যও হতে পারে। আমিও যে তার কাছে অদ্ভুত সব প্রস্তাব রাখি না এমন নয়। যেমন একবার বললাম, আসুন আমরা দেশি আউশের পুরোনো জাত নতুন করে চালু করি। যেমন প্রস্তাব তেমন শুরু। আমি আমাদের সংগ্রহ থেকে বেশকিছু পুরনো দিনের আউশ ধান তাকে দিলাম। তিনি তার এলাকায় সেগুলো নিয়ে চাষিদের দিয়ে প্রদর্শনী আবাদ শুরু করে দিলেন। আরেকবার তাকে বললাম, আয়ুব সায়েব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আক্ষেপ করেছেন যে চাষির ছেলে শিক্ষিত হয়ে আর মাঠে নামতে চায় না। কী করা যায় বলুন তো। তিনি আমার থেকেই জবাব আশা করছিলেন। আমি তাকে জানালাম, একটা প্রোগ্রাম চালু করতে চাই, 'বাজান চল যাই চল মাঠে লাঙল বাইতে'। তিনি বললেন, আমাদের কুটুরাকন্দি থেকেই শুরু হোক। আসলে ওখান থেকেই শুরু হয়েছিল। প্রথমে কুটুরাকন্দি তারপরে নওগাঁয়ের মান্দায়। তখন আমাদের যুগ্ম সচিব জমশের সায়েব রাষ্ট্রীয় প্রটোকল এড়িয়েই সাধারণ চাষির মতো আমাদের সঙ্গে এই প্রোগামে অংশ নিতেন। বেশ সার্থক প্রোগ্রাম ছিল। আমরা মাঠে নেমেছি। এরপর স্কুল- কলেজের ছেলেমেয়েরা আমাদের সঙ্গে মাঠে নেমেছে। কিন্তু এরপর আর এগুতে পারা যায়নি। কারণ রাজপথে পেট্রলবোমার খা- ব দাহন।

আয়ুব আলী অসুস্থ মানুষ। আগেই বলেছি ডায়েবেটিক এবং হৃদরোগ দুটোই আছে তার। ইনসুলিন নেয়ার কথা নিয়মিত। নিতে পারেন কিনা জানি না। ট্যাবলেট খেতে হয়। সেটাও ঠিকমতো জোটে কিনা জানি না। ঢাকায় কৃষি- প্রযুক্তি ধার করতে আসলেও প্রায়ই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনও হয়েছে ট্রেনে উঠেছেন। তিনি আমাকে জানালেন, স্যার শরীরটা ভালো লাগেতেছে না। তবুও তিনি চলে আসেন। মনে আছে বছর দুই আগে গাজীপুরে এসে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা তাকে কিছুটা সাহায্যের হাত বাড়াই। আমাকে বললেন ভারতে যাবেন চিকিৎসা নিতে। আমি বললাম এবারে দেশেই কিছুটা চিকিৎসা নেন। একটু সুস্থ হলে ভারতের কথা চিন্তা করবেন। আমাদের সাহায্যের টাকাটা না নিয়ে তিনি বাড়ি চলে গেলেন। বললেন, 'টাকাটা আপনার কাছে থাক। উদ্দেশ্য তো ছিল ওটা দিয়ে চিকিৎসা করা। কিছুটা যখন ভালো হয়ে গেছি তখন ও টাকার দরকার নেই।' সেবারে কিছুটা সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে যান। ইতোমধ্যে আবার খবর, হৃদরোগে ভর্তি হয়েছেন। এবার ঐ টাকাটার কথা মনে পড়ল। কাজেও লাগল। তিনি চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। কিছুদিন পরে আবার ফিরে আসলেন এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে জানালেন, আপনাদের কটি টাকা নিয়ে ভারতে না গিয়ে ভালো হয়েছে। ওখানে গেলে এই টাকায় কিছু হতো না, নির্ঘাৎ মরণ ছাড়া। তার চেয়ে দেশে থেকে টাকাগুলো দিয়ে জীবন ফেরত পেলাম। মন্দ কি!

তার রোগভোগার পাল্লা কিন্তু ক্রমান্বয়েই ভারি হচ্ছে। ক'দিন আগেই ব্রির আঞ্চলিক কেন্দ্র ভাঙ্গা থেকে আমার সহকর্মীরা জানালো যে. আয়ুব হোসেন নামে একজন একদিনের জন্য সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু রাত্রেই আমাকে জানানো হলো বেচারা ভীষণ অসুস্থ। তারা অস্বস্তি বোধ করছে। কারণ কে না কে লোকটি যদি মারা যায়! কারণ আয়ুব হোসেনকে তারা তেমন ভালো জানে না। আমি বললাম তার প্রাণটা বেশ শক্ত। তোমরা একটুখানি হাসপাতালে নিয়ে যাও। তেমন কিছু হবে না। কিন্তু আমিও ভয় পেয়েছিলাম। সত্যি যদি কিছু হয়ে যায়? আর ওদের যা বলেছিলাম, তা শুধু ওদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য। যাহোক খারাপ কিছু ঘটেনি।

গত মাসের ১৯ তারিখে (১৯ জুন ২০১৫) তিনি তার এলাকা খাজুরায় খেজুর আবাদ ও জিঙ্ক রাইসের (ব্রি ধান৬২) বীজ বিতরণ কর্মসূচিকে উদ্দেশ্য করে আবার আমাকে ডেকেছিলেন। অনুষ্ঠানটির প্রকৃত স্পনসর ছিল আমার প্রতিষ্ঠান- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। আমরা খেজুর গাছও লাগিয়ে থাকি। এটা আমাদের ধানভিত্তিক শস্যক্রম বিভাগের একটি প্রকল্প নির্ভর কার্যক্রম থেকে করা হয়। এ খেজুর সাধারণ খেজুর নয়। আরবি খেজুর। কয়েক হাজার গাছ বিতরণের কাজ এবং জিঙ্ক ধান বিতরণের কাজ মোটামুটি ভালোভাবেই শেষ হয়। তবে জিঙ্ক ধানের চাহিদা ওখানে আমাদের সাধ্যের চেয়ে বেশি ছিল। আয়ুব হোসেন সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। পরে বাকি পরিমাণ তাকে পাঠিয়ে দিতে হয়।

গতপরশু (২১ জুলাই ২০১৫) রাত ৯টায় একটি টেলিফোন আসে অপরিচিত নম্বর থেকে। অপরিচিত নম্বর ধরতে ভয় হয়। তবুও ধরলাম। সেই জরাজীর্ণ কণ্ঠ। স্যার আমি আয়ুব হোসেন। এসআরডিআই (মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন) এর ডরমেটরি থেকে বলছি। বলে রাখি এ প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরাও তাকে ভালোবাসে। তাকে বুঝার চেষ্টা করে। ঢাকায় আসলে সেখানেই তিনি রাত কাটান। কিন্তু ঈদের ছুটিতে সবাইতো দেশে। অথচ কি প্রয়োজনে আয়ুব হোসেন ঈদের পরদিনই ঢাকায় এসেছিলেন। তিনি আমাকে জানালেন, স্যার আমার শরীরটা খুবই খারাপ। আমাকে একটু হৃদরোগ হাসপাতালে নেয়া যায়! কোন জোর নেই। অথচ যেন কত জোর দিয়ে বলছেন। আমিও তেমন সুস্থ না। প্রমাদ গুনলাম। এত রাতে কিভাবে কি করা যায়। আমার

অফিসেও তো ঈদের আমেজ চলছে। পরে ড. মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীকে জানালাম। তাকে নিয়ে আয়ুব হোসেনের গ্রামে আমার বেশকিছু কর্মকা- ছিল। সে রাজি হলো যেন নিজের তাগিদেই। গাড়িচালক এনায়েতও রাজি হলো মানবিক কারণে। সেই রাতে ঢাকায় গিয়ে তারা তাকে সুন্দরমতো হৃদরোগ হাসপাতালে ভর্তি করে আসলেন। তার বাড়িতেও খবর দেয়া হলো। এখন পর্যন্ত তিনি হাসপাতালেই আছেন। হয়তো এ যাত্রায়ও রক্ষা পাওয়া গেল।

আয়ুব হোসেন এখন অবেলায়। তারপর সবসময়ের জন্য অসুস্থ। আমি তাকে বলেছি ঠিকানাটা সঙ্গে রাখতে। আর একটি ছবি। কখন কোথায় কী হয়? তারপরও তার চলা থেমে থাকে না। সেই ফুয়াদের গল্পের চড়ুই পাখির মতো আসা আর যাওয়া; চলছে অবিরত। তবে ফুড়ুৎ আর কতদিন চলতে থাকবে।... যাহোক তাকে দেখে খুব একটা অদৃষ্টবাদী মনে হয় না। কেন যেন মনে হয় মরণকেও তিনি ভয় পান না। তাই তাকে নিয়ে ভানুসিংহের (রবি ঠাকুরের) পদাবলীর সেই পদগুলো গাওয়া চলে কিনা-

মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যামসমান।/ মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,/ রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,/ তাপবিমোচন করুণ কোর তব/ মৃত্যু- অমৃত করে দান।/ তুঁহুঁ মম শ্যামসমান

[লেখক : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট]